গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ১৫ - ২১ এপ্রিল ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

''আমরা বিরুদ্ধ পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। এটা কোন বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না। আমাদের সবসময় বিচার করে দেখতে হবে, পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক তাকে মোকাবিলা করার জন্য একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে সংগঠনের সামনে যে সম্ভাবনা আছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা। সেখানে চেষ্টার কোন ত্রুটি যাতে না থাকে, সেটা প্রতিমুহূর্তে ভাল করে দেখা, নজর দেওয়াই হচ্ছে সত্যিকারের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে যেন কোন ফাঁক না থাকে। আমাদের ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব যদি বিরুদ্ধ পরিবেশের ওপরেই আমরা চাপিয়ে দিই, সেই মানসিকতাই যদি আমাদের গ্রাস করে, তাহলে এপথে আসাটাই আমাদের উচিত হয়নি। প্রতিটি দেশের সফল বিপ্লবের ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাই আমরা পাই যে, বহু ব্যর্থতা, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে লড়াই করতে করতেই, তাকে মোকাবিলা করতে করতেই একদিন সেসব দেশে বিপ্লব সফল হয়েছে।''

শিবদাস ঘোষ

(জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও বিপ্লবী জীবন প্রসঙ্গে)

ভ্যাট নিয়ে অসীমবাবু সত্য বলছেন কি ?

দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে গত ১লা এপ্রিল, ২০০৫ থেকে চালু করা হয়েছে যুক্তমূল্য কর বা ভ্যাট। এই কাজে কেন্দ্রের পূর্বতন বিজেপি ও বর্তমান কংগ্রেস সরকারের ডান হাত হিসাবে কাজ করেছে রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। গররাজি রাজ্যগুলোকে বুঝিয়ে ভ্যাট চালু করানোর জন্য এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত দিবারাত্র পরিশ্রম করেছেন এবং ভ্যাট চালু হবার পরেও সমানে পরিশ্রম করে চলেছেন। ভ্যাট চালু হলে চিন্তার কিছু নেই, এতে জনগণের উপকার হবে, যাঁরা ভ্যাট চালুর বিরোধিতা করছেন তাঁরা বিভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তি থেকে তাঁরা অমূলক আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন ইত্যাদি কথা অর্থমন্ত্রী বারবার জোর গলায় বলছেন এবং তা ফলাও করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। ''ভ্যাট নিয়ে নানা প্রশ্নের জবাবে অসীম দাশগুপ্ত'' শীর্ষক এই ধরনের বক্তব্য সম্বলিত একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রতি বর্তমান পত্রিকার (৪-৪-০৫) প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এই সাক্ষাৎকারে অসীমবাবু অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে অর্ধসত্য মিশিয়ে ভ্যাটের পক্ষে জনমত গঠনে ব্রতী হয়েছেন। সে যাই হোক, কেমনভাবে এবং কী যুক্তির আড়ালে অসীমবাবু এই মহৎ(!) কর্ম করছেন, তা বিচার করে দেখা যাক।

ভ্যাটের পক্ষে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন — ''আগে বিক্রয়কর ব্যবস্থার কিছু ত্রুটি ও সমস্যা ছিল। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, সেখানে করের উপর করের বোঝা চাপত। ধরুন, সাধারণ একজন শিল্পোদ্যোগী একটি পণ্য

চারের পাতায় দেখুন

৭ এপ্রিল এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে কলকাতায় ভ্যাটবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে ধর্মতলায় যায়। সেখানে ভ্যাট আইনের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ও বিদুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন দপ্তরে গ্রাহক বিক্ষোভ

সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহক, বিশেষ করে কৃষকদের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে হাজার হাজার বিদ্যুৎ গ্রাহক ৪ এপ্রিল কলকাতার সল্টলেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সেখানে একটি সভার পর তাঁরা মিছিল করে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন অফিসের সামনে গেলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। পুলিশের বাধাকে উপেক্ষা করে গ্রাহকদের একাংশ কমিশন দপ্তরে ঢুকে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল কমিশনের চেয়ারম্যানের হাতে স্মারকলিপি পেশ করে এবং তার ভিত্তিতেই আলোচনা হয়। স্মারকলিপিতে অন্যান্য দাবির মধ্যে কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ এবং গরিব-মধ্যবিত্ত-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে এক টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবি করা হয়। উপস্থিত জনতার সামনে বক্তৃতায় সঞ্জিত বিশ্বাস দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর পর্যালোচনা শেষ না করা পর্যন্ত তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি তুলে দেওয়া চলবে না। তিনি বলেন, জাতীয়

সাতের পাতায় দেখুন

সেনাদলে যোগ দিতে নারাজ মার্কিন যুবকরা

মার্কিন দখলদারীর বিরুদ্ধে ইরাকি জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রাম যত তীব্র হচ্ছে, মার্কিন প্রশাসন তত বেশি করে সেখানে সৈন্য পাঠানোর জন্য উদ্যোগ নিচ্ছে। ফলে বেকার সমস্যায় জর্জরিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই মুহূর্তে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের তোড়জোড় চলছে। কিন্তু মার্কিন যুবসমাজ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাইছে না। তারা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধে অংশ নিতে চায় না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে সেদেশের যুব সমাজের মধ্যে যে প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে, এ থেকেই তা পরিষ্কার। কোন যুবক যাতে ডলারের প্রলোভনে সামরিক বাহিনীতে যোগ না দেয় সেজন্য যুবকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, গড়ে উঠেছে 'ফাইট ইম্পিরিয়ালিজম, স্ট্যান্ড টুগেদার' (FIST) নামে একটি যুব সংগঠন। এই সংগঠন এক বিবৃতিতে বলেছে, আমেরিকার যুবসমাজ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধে কামানের খোরাক হতে চায় না।

উপায়ান্তর না পেয়ে সেনা-নিয়োগের কোটা পূরণ করতে অবশেষে বুশ প্রশাসন স্কুল-কলেজের ছাত্রদের দিকে নজর দিয়েছে। কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়া সর্বত্র ছাত্ররা পেন্টাগনের যুদ্ধ পরিকল্পনা ব্যর্থ করতে সচেষ্ট। গত ৯ মার্চ নিউইয়র্কের সিটি কলেজে সামরিক নিয়োগকর্তাদের সামনে ছাত্ররা যখন শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করছিল তখন পুলিশ তাদের উপর আক্রমণ করে কয়েকজনকে গুরুতরভাবে আহত করে। ইতিপূর্বে ৩ মার্চ উইলিয়াম প্যাটারসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিরুদ্ধে যখন হ্যান্ডবিল বিলি করছিল সেখানেও পুলিশ হানা দিয়ে গ্রেপ্তারি চালায়। ফলে ইরাক-যুদ্ধ শুধু ইরাকেই সীমিত নয়, তা আমেরিকার অভ্যন্তরেও যুদ্ধের সূচনা করেছে। (সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড, নিউ ইয়র্ক, ২৪ মার্চ ২০০৫)।

যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টি ও সরকারি সামরিক ব্যয় না বাড়িয়ে পুঁজিবাদ আজ আর টিকে থাকতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে যদি দেশে দেশে যুদ্ধবিরোধী আওয়াজ ওঠে এবং

সাতের পাতায় দেখুন

২৪ এপ্রিল শহীদ মিনারের জনসভায় যোগ দিন

মুর্শিদাবাদ

বন্যাভাঙন প্রতিরোধে আইনঅমান্যকারী ৬৩ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা খারিজ

অবশেষে মিথ্যা মামলার দায় থেকে মুক্ত হলেন বন্যাভাঙন প্রতিরোধ আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়া ৬৩ জন, যার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ছিলেন। ৩১ মার্চ জেলা আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক সৌরিশ চক্রবর্তী এঁদের মিথ্যা মামলা থেকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করেন।

বিগত ২০০০ সালের ১৭ জুলাই বন্যাভাঙন প্রতিরোধে পাড় বাঁধানোর নামে বর্ষাকালে পদ্মার জলে বোল্ডার ফেলা এবং সরকারি অর্থ নয়ছয়ের প্রতিবাদ জানাতে গেলে ভগবানগোলার খড়িবোনায় পুলিশ ও ই এফ আর বাহিনী ব্যাপক লাঠি-গুলি চালায়। এতে চারজন চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়। মৃত্যু হয় শেখ নহিরুদ্দিনের। এই পুলিশি নৃশংসতার প্রতিবাদে এবং নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে আইন অমান্য আন্দোলন থেকে পুলিশ বর্ষীয়ান ব্যক্তিত্ব সহ ৬৬ জন ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী ও মহিলা আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করে থানা লক-আপে নির্যাতন চালায়। তারপর পুলিশ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র এবং বোমা নিয়ে পুলিশের ওপর চড়াও হওয়ার মিথ্যা মামলা দায়ের করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে হয়রানি-হাজিরা-শুনানি চলার পর গত ৩১ মার্চ বিচারের রায়ে মিথ্যা মামলা খারিজ হয়ে যায়। অভিযুক্তরা হলেন গণকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী, বামপন্থী ব্যক্তিত্ব সুখেশ্বর পাল, শিবু সান্যাল, সুকুমার সিংহ, নাট্যশিল্পী কমল সমাজদার, শিক্ষক নেতা অনিল কুমার দাঁ, কমলকান্তি ঘোষ, শ্রমিক নেতা আব্দুস সঈদ সহ জননেত্রী খাদিজা বানু, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীরা। মামলা চলাকালীন তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

মিথ্যা মামলায় গণআন্দোলনের কর্মীদের এই হয়রানির তীব্র নিন্দা করেছেন মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যাভাঙন প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সাধন রায় ও আব্দুস সঈদ। জেলার বিশিষ্ট আইনজীবী কাঞ্চনলাল মুখোপাধ্যায় এবং জিনারুল হক আন্দোলনকারীদের পক্ষে সওয়াল করেন। ২৪ আগস্ট ২০০০ সালেও ৬৬ জন আইনঅমান্যকারীর পক্ষে জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের সকল আইনজীবী কোনরকম পারিশ্রমিক ছাড়া সম্মিলিতভাবে সওয়াল করেছিলেন। কমিটির অফিস সম্পাদিকা খাদিজা বানু বলেন, এটা আন্দোলনের ঐতিহাসিক জয়। সকল রকম সাহায্য ও আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য জেলাবাসীকে অভিনন্দন জানানো হয়। উল্লেখ্য, মানবাধিকার কমিশন ইতিপূর্বে পুলিশের গুলিতে সেখ নহিরুদ্দিনের মৃত্যুর জন্য রাজ্য সরকারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী জলঙ্গী সহ পদ্মা-ভাগীরথীর ভাঙনপীড়িত অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের পুনর্বাসনের দাবি জানান। সাথে সাথে আগামী দিনে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেন।

বীরভূম

বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সিউড়ীতে বিক্ষোভ

কোনরকম শুনানি ছাড়াই রাজ্য সরকারের মদতে একতরফাভাবে বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি ও তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি প্রথা বিলোপ নীতির বিরুদ্ধে এবং জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল সহ অন্যান্য দাবিতে গত ৪ এপ্রিল সিউড়ী শহরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির বীরভূম জেলা শাখার উদ্যোগে এই বিক্ষোভ মিছিলে শতাধিক গ্রাহক অংশ নেন। সি-আই দপ্তরে বিক্ষোভের পর মিছিল জেলাশাসকের দপ্তরে পৌঁছায়। সেখানেও দীর্ঘক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ চলে। বৈদ্যনাথ মাল, অধ্যাপক বিজয় দলুই প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা দাবি আদায়ের আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যায় গ্রাহকদের অংশগ্রহণ করতে এবং স্থানীয় ভিত্তিতে গ্রাহক কমিটি গড়ে তুলে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

পূর্ব মেদিনীপুর

নয়া পঞ্চায়েত করের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

তমলুক ১নং ব্লকের পিপুলবেড়্যা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত নয়া পঞ্চায়েত কর চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। গত ৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই দলের পক্ষ থেকে গ্রামপঞ্চায়েত প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে এই নয়া কর চালুর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি করা হয়। প্রধান বলেন, যারা এই কর দিতে চায় না তাদের ৬ এপ্রিলের মধ্যে লিখিত আবেদন জানাতে বলা হয়েছে। প্রতিনিধিরা বলেন, লিখিত অভিযোগ জানানোর বিষয়টি অনেকেই জানে না। যারা জেনেছে তারা অভিযোগ জানিয়েছে। এর পরেও যদি এই নয়া কর চালু করার উদ্যোগ হয় তাহলে অঞ্চলের শত শত মানুষকে নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন — কমরেডস্ শীলা দাস, পঞ্চানন মান্না, শম্ভু মান্না ও সতীশ বাগ।

ঝাড়খণ্ড

পোটকা ও ডুমুরিয়ায় কৃষক বিক্ষোভ

ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলার পোটকা বিডিও অফিসে গত ২৯ মার্চ এস ইউ সি আই এবং কে কে এম এস-এর উদ্যোগে ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের দুই শতাধিক কৃষক-খেতমজুর-ছাত্র-যুব-মহিলা মিছিল করে এসে বিক্ষোভ দেখায়। দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বিমল দাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল বিডিও'র কাছে ১৭ দফা দাবিযুক্ত স্মারকলিপি পেশ করেন। মূল দাবিগুলি ছিল — ঝাড়খণ্ড রাজ্যে বিপজ্জনক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত বাতিল, ব্লকের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র ও একটি সরকারি কলেজ স্থাপন, গ্রামে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, প্রত্যেক গ্রামে সেচের জন্য বাঁধ নির্মাণ, পুকুর, ক্যানেল নির্মাণ, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজের ব্যবস্থা, অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বার্ধক্যভাতা দান, বিদ্যুতের দাম কমানো, গরিবদের বিপিএল কার্ড দেওয়া প্রভৃতি। বিডিও দাবিগুলি পূরণের জন্য যথাযথ ভূমিকা নেবেন বলে কথা দেন। জমায়েতে বক্তব্য রাখেন কমরেডস বিমল দাস, ধীরেন ভকত ও সনকা মাহাতো। ২৯ মার্চ ডুমুরিয়া বিডিও অফিসে এস ইউ সি আই এবং কে কে এম এস এস-এর উদ্যোগে ২২ দফা দাবিতে নারী-পুরুষ-ছাত্র-যুবকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ডেপুটেশন দেয়। ডেপুটেশনের আগে বিক্ষোভ জমায়েতে বক্তব্য রাখেন দলের ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সদস্য ও কে কে এম এস-এর সম্পাদক কমরেড সীতারাম টুডু, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সরলা মাহাতো প্রমুখ।

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ

ত্রিপুরায় বিদ্যুৎমাশুল ৭৭ শতাংশ বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১ এপ্রিল আগরতলা বিদ্যুৎভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এস ইউ সি আই

ভগৎ সিং শহীদ দিবস উদ্‌যাপন

ভোপাল

এ আই ডি এস ও ভোপাল কমিটির উদ্যোগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার বলিষ্ঠ প্রতিভূ শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং-এর ৭৪তম শহীদ দিবস পালিত হয় হাবিবগঞ্জে। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ডি এস ও-র সহসভাপতি কমরেড রামাবতার শর্মা। প্রধান অতিথি ছিলেন এস ইউ সি আই-এর ভোপাল কমিটির ইনচার্জ কমরেড জে সি বারই। ডি এস ও-র ভোপাল শাখার সভাপতি কমরেড অসিত মোহান্তি সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ডি এস ও-র সাগর জেলা কমিটির উদ্যোগে তিলী লোকাল কমিটি কার্যালয়ে ২৩ মার্চ শহীদ দিবস পালন করা হয়। কমরেড জাগৃতি শর্মা, শিবপ্রসাদ পটেল, অশোক কুশতাহা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন সাগর বিশ্ববিদ্যালয় ডি এস ও ইউনিটের ইনচার্জ কমরেড রাজেশ পটেল।

মুম্বই

২৩ মার্চ শহীদ-ই-আজম ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেব-এর শহীদ দিবস পালিত হয় দামুনগরের নালন্দা বুদ্ধবিহার ময়দানে এক জনসভার মাধ্যমে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড গোপীনাথ কাম্বলে এবং সভা পরিচালনা করেন কমরেড উমাশঙ্কর মৌর্য। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড সঞ্জীব শর্মা, এস সি চৌহান, জয়রাম বিশ্বকর্মা, শ্রবণ কুমার দুবে, কে কুলশ্রেষ্ঠ এবং প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই-এর মুম্বই ইউনিটের ইনচার্জ কমরেড এ কে ত্যাগী।

বক্তারা ভগৎ সিং-এর বিপ্লবী জীবন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর বিচারধারার প্রাসঙ্গিকতা, স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসকামী ও আপসহীন ধারার দ্বন্দ্ব, অবিভক্ত সিপিআই-এর অকমিউনিস্ট ভূমিকা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।

স্কুলে ট্রেড লাইসেন্স — প্রতিবাদ বিক্ষোভ

কংগ্রেস-তৃণমূল পরিচালিত মেদিনীপুর পুরসভা নিজস্ব আয়ের সংস্থান করতে মেদিনীপুর শহরের সমস্ত বেসরকারি বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ট্রেড লাইসেন্স-এর আওতায় আনার কথা ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে পুরসভা শহরের ৪০টি স্কুলে সার্কুলার দিয়েছে — বছরে ১০০০ টাকা করে ট্রেড লাইসেন্স ফি দিতে হবে। পুরসভার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ৩০ মার্চ পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে, কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ট্রেড লাইসেন্স-এর আওতায় এনে শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করা যাবে না। এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক এবং ছাত্রস্বার্থবিরোধী। প্রতিনিধিরা বলেন, ''পৌরসভার এই সিদ্ধান্তে স্কুলগুলোতে ফি'র পরিমাণ আরও বাড়বে। গরিব-মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ সঙ্কুচিত হবে।'' উপপুরপ্রধান দাবিগুলোর যৌক্তিকতা স্বীকার করে বলেন যে, বিষয়টি পুনরায় পৌরসভার কাউন্সিলারদের মিটিংয়ে বিবেচনা করার জন্য রাখবেন।

এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ডিএসও'র জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত পুরসভা প্রত্যাহার না করলে শহর জুড়ে অভিভাবক ও ছাত্রদের নিয়ে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এই বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অনিন্দিতা জানা, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন সামন্ত।

পানচাষীদের ডেপুটেশন

মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও হলদিয়া মহকুমা এবং কাঁথি মহকুমার দুটি থানায় পান চাষই যাদের একমাত্র জীবিকা, পানের দাম ভীষণভাবে পড়ে যাওয়ায় তাদের জীবন-জীবিকার সংকট চরমে পৌঁছেছে। অনেকেই পান চাষ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ১০ হাজার পান যেখানে ৮০০০ টাকায় বিক্রি হত, এখন তা ৮০০/৯০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ট্রেনে পান বুকিংয়ের সমস্যা দেখিয়ে পাইকাররা পান কেনা বন্ধ করে দেয়, পানের দাম কমিয়ে দেয়। এই সব সমস্যা সমাধানের দাবিতে ৪ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক অফিসে ডেপুটেশন দেয় মেদিনীপুর জেলা পানচাষী সমন্বয় কমিটি। ঐদিন ট্রেনে পানের বুকিং বাড়ানোর দাবি জানিয়ে মেছেদা রেলস্টেশন মাস্টারের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এই সংগঠনের সম্পাদক কমরেডস্ সূর্য জানা, সন্তোষ সী, গোষ্ঠ কুইল্যা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উন্নয়নের পুঁজিবাদী মডেল গরিবদের করছে ভিটেছাড়া

'উন্নয়ন' — এই শব্দটি আজকাল সর্বত্র শোনা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে আঞ্চলিক নেতারাও উঠতে বসতে এই শব্দটি ব্যবহার করছেন। এক্ষেত্রে ডান বা তথাকথিত বামেদের মধ্যে কোন তফাৎ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যাঁরা একদিন 'জনগণতান্ত্রিক' বা 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র স্লোগানে গলা ফাটাতেন, আজ তাঁদের অনেককে দেখা যাচ্ছে উদ্বাহু হয়ে 'উন্নয়নে'র ভজনা করতে। কিন্তু 'উন্নয়ন' ব্যাপারটা কী ? টিভি বা প্রচারমাধ্যমে চোখ ফেললেই দেখা যাবে — ঝকঝকে চকচকে রাস্তা, পরিষ্কার ফুটপাত, ফ্লাইওভার, শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স, গগনচুম্বী ফ্ল্যাটবাড়ি বা অফিস, বিলাসবহুল তারকাখচিত হোটেল বা রেস্তোরাঁ, নাইটক্লাব, ডিস্কোথেক, বিশাল বিশাল আলোকিত বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং, আরও কত কী। সরকারি ও বেসরকারি প্রচারমাধ্যমগুলো অষ্টপ্রহর ইষ্টনামের মতো জপে চলেছে — এটাই উন্নয়ন। এই তথাকথিত উন্নয়নের আলোর ঝলকানিতে সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। সরকারি তরফে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে আলোর ঝলকানির পিছনে 'নেই রাজ্যে'র যে দেশটা আছে, সেটাকে — যেখানে শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, বিশুদ্ধ পানীয় জল নেই, মাথার ওপর আচ্ছাদন নেই, রোজগারের ব্যবস্থা নেই, যাদের রোজগার আছে তাদেরও রোজগারের নিরাপত্তা নেই, এমনকী নেই মানুষের জীবন-সম্পত্তির নিরাপত্তা, মায় নারীর সম্ভ্রম।

উন্নয়নের বলি কারা

গোটা দেশ জুড়ে ছুটে চলেছে বুলডোজার, পে-লোডার — ধ্বংসাত্মক উন্নয়নের রথ, যার বলি হচ্ছে অসংখ্য বস্তিবাসী, ঝুপড়িবাসী, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। বুলডোজারের ঘায়ে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে অসংখ্য ঝুপড়ি, গরিব ও দরিদ্রতম মানুষের বাঁচার আশ্রয় ও সম্পদ। গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাইট-স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়। উচ্ছেদ চলছে খালপাড় থেকে, উৎখাত হচ্ছে রেললাইনের পাশ থেকে, রাস্তার ধার থেকে, ফুটপাতে হকারির জীবিকা থেকে। এমনকী উন্নয়নের ধাক্কায় নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে চাষের জমি থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য করা হচ্ছে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্রচাষীকে। পরিবেশের কোন তোয়াক্কা না করেই ভরাট করা হচ্ছে বিস্তীর্ণ জলাভূমি, কাজ হারাচ্ছে মৎস্যজীবী ও জেলেরা। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করা হচ্ছে। আর সেখানে হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রোমোটার, বিল্ডার ও বড় বড় রাজনৈতিক দলের মাফিয়ারা। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় ১০০ শতাংশ বিদেশি পুঁজি আসতে পারে। ফলে আর দেরি নেই, বিদেশি হাঙররা এলো বলে। এই তথাকথিত উন্নয়নের পরিচিত ছবিটা আজ ভারতবর্ষের অধিকাংশ ছোট বড় শহরে গেলেই চোখে পড়বে। অথচ বহুক্ষেত্রেই উচ্ছেদ হওয়া এই মানুষগুলোর ভোটার লিস্টে নাম ছিল; অনেকেরই ছিল ভোটের পরিচয়পত্র ও রেশনকার্ড। অনেকের কাছ থেকে পুরসভা কর বাবদ অর্থ আদায় করেছে। এরা শহরেরই বাসিন্দা, এদেরই শ্রম তো শহর কাজে লাগায়। এরা মুটেমজুর, রিক্সা-ভ্যান চালক, এরা জমাদার, ধোপা, নাপিত, কলমিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান; এদের বাড়ির বৌ-মেয়েরা মধ্যবিত্ত বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। এদেরই ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করে সরকারি ও বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো এবং প্রয়োজন ফুরোলেই তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করে। শহর উন্নয়নের নামে এদের উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে এক দশকের বেশি সময় ধরে। শুধু বাসস্থান থেকে নয়, এদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে জীবন-জীবিকা থেকে, সংস্কৃতি ও পরম্পরা থেকে।

কোথা থেকে এল এই সর্বনাশা উন্নয়নের বুলডোজার

৯০-এর দশকের গোড়াতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর থেকে 'গ্যাট' ব্যবস্থার ফাঁসটা দৃঢ় হতে শুরু করে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের শোষক পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের নিজস্ব পুঁজিবাদী স্বার্থে এই ব্যবস্থাকে মেনে নেয়, যদিও তৃতীয় বিশ্বের সব দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী একই রকম শক্তিশালী নয়। এরই ধারায় বিশ্বের মানুষকে দুটি শব্দের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যে একটি হল বিশ্বায়ন (globalisation) ও অপরটি উদারীকরণ (liberalisation)। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এসেছে বর্তমানের ভয়ঙ্কর 'উন্নয়নে'র ভাবনা-ধারণা। গত শতাব্দীতে তিরিশের দশকের গোড়াতে একদিকে যখন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত, তখনই অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি গোটা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। সেই উন্নয়ন ও অগ্রগতি দেখে রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন, যার নিদর্শন রয়েছে 'রাশিয়ার চিঠি' বইতে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের এই বিস্ময়কর উন্নয়ন দেখে সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার বইছিল। একদিকে নিজস্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের প্রতি জনগণের আকর্ষণ — এই দুই সমস্যার মোকাবিলায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি তখন জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভেক ধরে একদিকে সরকারি টাকা ঢেলে কৃত্রিমভাবে দেশের ভেতরে চাহিদা বাড়াবার চেষ্টা শুরু করে, আবার একেই তারা জনকল্যাণমূলক কাজ বলে দেখিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, জনগণের জন্য কেবল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নয়, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও চিন্তা করে এবং দায়িত্ব নেয়। এই কারণেই পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সেইসময়ে জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, বাসস্থান, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়কে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনার চেষ্টা করা হয়। এর জন্য সরকারি বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। একথাটা স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রযোজ্য।

পাশাপাশি প্রথম দিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পায়ন যেমন যেমন হয়েছে ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, তেমন তেমন মানুষ শিল্পে মজুর খাটার প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে শহরে ও তার চারপাশে ভিড় করেছে। কৃষিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অমোঘ নিয়মে গরিব ও প্রান্তিক চাষী প্রতিবছর হয় খরায় নয় বন্যায় সর্বস্বান্ত হয়ে, মরশুমে ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে এবং ক্ষুদ্র চাষ ক্রমাগত অলাভজনক হয়ে যাবার ফলে ভূমিহীন খেতমজুরে ও নিঃস্বে পরিণত হয়েছে। তাই আজ যাদের আমরা মুম্বইয়ের ধারাবি বস্তিতে, রফিকনগর বা আন্নাভাউ সাঠে নগর বস্তিতে দেখছি, তাদেরও একদিন সামান্য হলেও জমি ছিল, ঘর ছিল মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ বা উত্তরপ্রদেশের সুদূর গ্রামে। কলকাতার বেলেঘাটা খালপাড় বা টালি নালার পাশে অথবা গোবিন্দপুর বা ঢাকুরিয়ায় রেললাইনের পাশে ঝুপড়ি বা বস্তিতে যাদের দেখতে পেতাম বা আজও পাচ্ছি, তারা হয় দেশবিভাগের বলি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু, নয়তো আশেপাশের জেলাগুলির গ্রামাঞ্চল থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষ। প্রায় একই ইতিহাস দিল্লির যমুনা পারের বস্তিবাসীদের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘদিন এই গরিব বস্তিবাসীদের হটিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারেনি বিভিন্ন রাজ্য সরকার। দিল্লির তুর্কমান গেটে বুলডোজার চালিয়ে বসতি উচ্ছেদ করায় সত্তরের দশকের শেষদিকে দেশজুড়ে ধিক্কৃত হয়েছিলেন প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধী।

৯০-এর দশকের গোড়াতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর একমেরু বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদীদেরই আধিপত্য একচেটিয়া রূপে দেখা দেয়। এই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের যথেচ্ছাচারের সামনে বাধা হিসাবে আর সমাজতান্ত্রিক শিবির নেই। বিশ্বের সাধারণ মানুষও সাম্রাজ্যবাদীদের একতরফা প্রচারে কিছুটা বিভ্রান্ত ও দিশেহারা। এমতাবস্থায় দ্রুত ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ভাবনাধারণা। বিশ্বায়নের যুগে গোটা বিশ্বটাই তাদের অবাধ লুঠের বাজারে পরিণত হয়েছে। সমস্ত দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী চাইছে দেশে দেশে সস্তাশ্রম, কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ করে মুনাফা বাড়িয়ে তুলতে। এ নিয়ে তাদের দ্বন্দ্ব আছে, আবার নিজ নিজ স্বার্থে বোঝাপড়াও আছে। পুঁজিবাদের বর্তমান তীব্র সঙ্কটের যুগে যখন বুর্জোয়া মূল্যবোধ ও নৈতিকতা চরম অবক্ষয় ও সঙ্কটে জর্জরিত, তখন স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্বে মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন ও রক্ষার দাবিতে বুর্জোয়ারা লড়াই করেছে, যে মূল্যবোধ ও মানবিকতার চর্চা করেছে, আজ তা নিঃশেষিত, মৃত। তাই আজ আর আব্রাহাম লিঙ্কন, অলিভার ক্রমওয়েলের বা রুশো-ভলটেয়ারের জন্ম হচ্ছে না; জন্ম হচ্ছে স্বৈরাচারী বুশ ও ব্লেয়ারের, যারা আজ গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও মূল্যবোধকে হত্যা করছে, অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার ও দেশে দেশে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ করছে। তাই শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করাটাই আজ অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলো পশ্চাদপদ দেশগুলোকে ঋণ দেওয়ার সঙ্গে শর্ত দিচ্ছে সমস্ত জনকল্যাণকামী কর্মসূচিকে ছেঁটে ফেলতে হবে, ব্যয়সঙ্কোচ করতে হবে, জনকল্যাণমূলক খাতে বাজেট বরাদ্দ কমাতে হবে — যার ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ইত্যাদির দাম হু হু করে বাড়ছে এবং ইতিমধ্যেই তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। অপরদিকে তারা শর্ত দিচ্ছে সরকারি নিয়মকানুন বিধিনিষেধ শিথিল করতে হবে এবং দেশের শহরগুলো ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিশ্বায়নের ও বাজার অর্থনীতির উপযোগী করে তুলতে হবে, যাতে অতি দ্রুত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি, পণ্য, প্রযুক্তি ও পরিষেবা সহজে ঢুকতে ও বের হতে পারে। তাই উন্মাদের মতো চলছে 'উন্নয়ন', অনেকটা কসমেটিক লাগিয়ে কৃত্রিম সৌন্দর্য বৃদ্ধির মতো — যার প্রধান বলি হচ্ছে দেশের দরিদ্রতম মানুষ, যারা নিজ দেশে আবার উদ্বাস্তু হতে চলেছে। ঘটনায় প্রকাশ, মুম্বইতে এই উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া গরিব মানুষদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে মুছে দেবার ষড়যন্ত্রও চলছে, যাতে তারা এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটের 'পবিত্র' অধিকার আগামী নির্বাচনে প্রয়োগ করে এই সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে না পারে (সূত্র ঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি, প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো মুম্বইয়ের বিশিষ্ট নাগরিকদের স্মারকলিপি)।

উচ্ছেদ সংক্রান্ত কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান ও ঘটনা

স্বপ্নের নগরী মুম্বই ঃ মুম্বই শহরে মোট ৮০ হাজারের বেশি বস্তি আছে। মুম্বইয়ের মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ। এর মধ্যে ৭৫ লক্ষই বস্তিবাসী। রাতারাতি মুম্বইকে চীনের সাংহাই বানাবার লক্ষ্যে মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে ৩৭০০ কোটি টাকা। শর্ত হচ্ছে এই 'নোংরা ও দৃষ্টিকটু' বস্তি ও ঝুপড়িগুলোকে দ্রুত উচ্ছেদ করতে হবে। শহরকে করতে হবে 'সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন', যাতে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি ও তাদের প্রতিনিধিরা পরম আরামে বসবাস করতে পারে, অবাধে ঘোরাফেরা করতে পারে। রাজ্য সরকার এই কাজের জন্য সময় ধার্য করেছে মাত্র দু'মাস। সকল কাজে যে সরকারের ১৮ মাসে বছর হয়, তারা বেনজির তৎপরতায় গোটা মুম্বই শহর জুড়ে শুরু করেছে ধ্বংসলীলা। ইতিমধ্যে ধ্বংস করা হয়েছে ৬৭ হাজার ঘরবাড়ি। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে আন্নাভাউ সাঠে নগরের ২ হাজার ঘরবাড়ি একদিনেই বুলডোজার চালিয়ে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ খোলা আকাশের নিচে। খবরে প্রকাশ, মহারাষ্ট্রের রাজ্য সরকার একদিনেই ৬৭০০ বস্তিবাড়ি ও ঝুপড়ি ধ্বংস করেছে, যা দেখে গাজা ভূখণ্ডে প্যালেস্টাইন বসতি ধ্বংসকার্যে রত ইজরায়েলি সৈন্যরাও নিজেদের অক্ষমতার কথা ভেবে হয়তো লজ্জা পাবে। মায়েদের কান্না, শিশুর আর্তনাদ, পিতার অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসে মুম্বইয়ের বাতাস আজ ভারাক্রান্ত। অসুস্থ শিশুর পায়ের মাংস খুবলে নিয়ে যাচ্ছে ইঁদুরে — এ দৃশ্যও দেখা গিয়েছে (সূত্র ঃ সংবাদ প্রতিদিন, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫)। একই ঘটনা ঘটে চলেছে রফিকনগর বস্তিসহ আরও অসংখ্য বস্তিতে। বন্ধ হয়ে যাওয়া সুতোকলের জমি থেকে হাজার হাজার শ্রমিক পরিবারকে উচ্ছেদ করে সেই জমি বিল্ডার ও প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

চেন্নাই ঃ চেন্নাই শহরের শতকরা ৪০ ভাগ লোক বস্তিবাসী। প্রায় ৬৯ হাজার পরিবারকে সরকার উচ্ছেদ করে নিয়ে যাবে শহর থেকে অনেক দূরে। শহরের সৌন্দর্যায়ন ও পর্যটন শিল্পের বিকাশের স্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্পের বলি হচ্ছে এই দরিদ্র জনসাধারণ।

দিল্লি ঃ দিল্লিতে ৭০ শতাংশ মানুষ বাস করেন অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের বাসস্থানে। এর মধ্যে ৭৫ হাজার পরিবার, যাঁরা যমুনাপাড়ে বস্তি বা ঝুপড়িতে থাকেন তাঁদের উপর উচ্ছেদের খাঁড়া ঝুলছে। কারণ এরাই নাকি যমুনা নদী দূষণের জন্য দায়ী।

হায়দরাবাদ ঃ অন্ধ্রপ্রদেশের 'হাইটেক' মুখ্যমন্ত্রী নামে খ্যাত চন্দ্রবাবু নাইডু'র টিডিপি সরকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, হোটেল, শপিং কমপ্লেক্স করার জন্য বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সস্তায় জমি দিয়েছে। অথচ শহরকে ঢেলে সাজাবার জন্য গরিব মানুষের ১০ হাজার ঘরবাড়ি ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

কলকাতা ঃ কলকাতায় এই উচ্ছেদের সর্বনাশা কর্মকাণ্ড শুরু হয় বামফ্রন্টের জমানায় ৮০-এর দশক থেকে। চেতলায় বস্তি উচ্ছেদ দিয়ে তাদের হাতেখড়ি। তা ভয়ঙ্কর রূপ নেয় '৯৩-'৯৪ সালে। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক সংস্থা বিশ্বব্যাঙ্ক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাঙ্কের (এডিবি) কাছ থেকে রাজ্য সরকার তিন হাজার কোটি টাকারও বেশি ঋণ নেয় বিভিন্ন প্রকল্পকে রূপায়িত করার জন্য।

ঋণদাতাদের শর্তানুসারে শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। ই এম বাইপাসের সাথে প্রতিটি কানেক্টর

ছয়ের পাতায় দেখুন

কেন এস ইউ সি আই-কে

শিবদাস ঘোষ

এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটি অসংখ্য ভুল করেছে, কেবলমাত্র এই কারণেই যে আমরা এস ইউ সি আই-কে আর একটা পাল্টা কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে তুলেছি — একথা ঠিক নয়। ... একটি দল দু'ধরনের ভুল করতে পারে। তার একটি হ'ল, মার্কসবাদী মূল দৃষ্টিভঙ্গী, বিচারবিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি আয়ত্ত করতে না পারার ফলে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মার্কসবাদ নির্ধারিত মূলনীতিগুলি অনুসরণের ক্ষেত্রে ভুল এবং তার ফলে একটি বিশেষ বিপ্লবের স্তর এবং তার রণনীতি, অর্থাৎ একটি বিশেষ বিপ্লবের মূলনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভুল। মনে রাখতে হবে, এ ধরনের ভুলের সাথে দলের শ্রেণীচরিত্রের প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আর, দ্বিতীয় ধরনের ভুলটি হলো, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, বিচারবিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে মূলত ঠিক থেকেও দলের উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে মূলনীতিগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল। এই শেষোক্ত ধরনের ভুল হলেই যে সাথে সাথে দলটির শ্রেণীচরিত্র পাল্টে যায় — তা নয়। অবশ্য এ ধরনের ভুল যদি একটার পর একটা হতেই থাকে এবং এই ভুলগুলির থেকে উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে যদি শেষপর্যন্ত সেগুলিকে সংশোধন করা সম্ভব না হয়, তাহলে ধীরে ধীরে একদিন দলটির শ্রেণীচরিত্রও পাল্টে যেতে বাধ্য। কিন্তু, প্রথম ধরনের ভুল, অর্থাৎ মার্কসবাদী মূল দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিচারবিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে যে বিচ্যুতি, তার সাথে দলটির শ্রেণীচরিত্রের প্রশ্নটি সরাসরিভাবে জড়িত। কারণ, একটি দল শুধুমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে নিজেকে জাহির করছে এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী 'ভোকাবুলারি'র (শব্দাবলীর) সাহায্যে নিজেদের বক্তব্য প্রচার করছে, অথচ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কসবাদী মূল দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিচারবিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি অনুসরণ করছেনা, মানেই হচ্ছে — সে দলটি জ্ঞাতসারেই হোক্, অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক্ — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সাম্যবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়েই আসলে অন্য কোন শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী এবং বিচারবিশ্লেষণ ও প্রয়োগপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। **তাই ভুল করে ভুল স্বীকার করাটাই বড় কথা নয়, ভুলের চরিত্র নির্ধারণই মার্কসবাদীদের কাছে মূল বিচার্য বিষয়।** ...

... এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটি গঠনের পিছনে এ দলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অনেকের এবং অনেক নেতা ও অসংখ্য কর্মীর গভীর নিষ্ঠা, সততা ও আত্মত্যাগের কথা আমি জানি এবং আমি তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখেই দেখি। কিন্তু, তাঁদের এত আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ না করার জন্য তাঁরা যে এ দলটিকে একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল হিসাবে গড়েই তুলতে পারেননি, এ সত্যকেও আমি কোনমতেই অস্বীকার করতে পারিনা। ...

... শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে কোন রাজনৈতিক দলই কোন না কোন শ্রেণীর দল। অর্থাৎ উৎপাদনের বিকাশের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে একটি দেশে যে শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব বর্তমান থাকে তার কোন না কোন একটির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শগত ও নৈতিক আশাআকাঙ্ক্ষাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার রাজনৈতিক অস্ত্রই হচ্ছে সেই শ্রেণীর রাজনৈতিক দল। তাহলে, দল বলতে মার্কসবাদীরা বুঝে থাকে শ্রেণী দল যা একটা বিশেষ শ্রেণীগত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী এবং সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী চিন্তাগত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ওপরেই গড়ে ওঠে, সে সম্বন্ধে দলের নেতা ও কর্মীরা সচেতন থাক বা না থাক, যেটা দলকে এবং দলের মূল বিচারবিশ্লেষণকে এবং দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক আচরণের সংস্কৃতিগত ও রুচিগত দিকটিকেও প্রভাবিত করে চলেছে।...

...একটি দল শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দল কি দল নয় — এই জটিল বিচারটি করবো আমরা কীসের সাহায্যে? ...লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন, একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হতে পারেনা এবং এইজন্যই একটি বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল গড়ে উঠতে পারে না। লেনিন যখন বলেছেন বিপ্লবী তত্ত্ব, তখন তিনি একটি দলের শুধু রাজনৈতিক প্রোগ্রাম এবং পলিসি বোঝাতে চান নি, তিনি বিপ্লবী তত্ত্ব বলতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কর্তৃক জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণাগুলিকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে কো-অর্ডিনেট (সংযোজিত) করে একটি পুরো জ্ঞানের পরিমন্ডলকেই (epistemological category) বুঝিয়েছেন।

তাহলে, কোন দল বিচারের ক্ষেত্রে প্রথমত, দলটির বিপ্লবী রাজনৈতিক তত্ত্বটিকে বিচার করে দেখতে হবে। দেখতে হবে, যে রাজনৈতিক তত্ত্বটিকে তারা বিপ্লবী বলে প্রচার করছে তা আসলে বিপ্লবী কি না। অর্থাৎ তাদের বিপ্লবী তত্ত্বটি আমাদের সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিপ্লবের যে জটিল প্রক্রিয়াটি চালু রয়েছে তার যথার্থ ও বাস্তব প্রতিফলন কিনা। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে, দলটির আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজস্ব কোন বিশ্লেষণ আছে কি নেই এবং যদি থাকে তাহলে সেটি যথার্থ মার্কসবাদসম্মত বিশ্লেষণ কি না। তৃতীয়ত, এগুলো দেখার সাথে সাথে দল বিচারের ক্ষেত্রে আরও দেখতে হবে, প্রতিটি ঘটনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেই দলের বিচারধারা (methodological approach) কী এবং দলের মূল রণনীতি, প্ল্যান, প্রোগ্রাম এবং সংগ্রাম পরিচালনার কৌশল কোন্ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে এবং চতুর্থত দেখতে হবে, সেই দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আচরণ এবং চলবার রীতিনীতি কোন্ শ্রেণীর সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত করছে। এখানে মনে রাখতে হবে, নেতা ও কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে ও জনতার সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি ও যুক্তিহীন আচরণে প্রশ্রয়দান, নানা বুর্জোয়া কুসংস্কারের প্রভাব, অন্ধতা, একগুঁয়েমী, উচ্ছৃংখলতা, হামবড়া ভাব, মিথ্যা বলার অভ্যাস — এগুলো থাকলে বুঝতে হবে, বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান।

তাহলে দেখা গেল, দল বিচারের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যেমন পার্টির বিপ্লবী তত্ত্বকে প্রথমে বিচার করতে হবে, তেমনি সাথে সাথে সেই দলের চিন্তা ও বিচারপদ্ধতি এবং দলের নেতা ও কর্মীদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের মধ্যে সংস্কৃতিগত মান যা তাঁরা প্রতিফলিত করছেন, তাকেও বিচার করে দল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। কারণ, মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়া মানবতাবাদ থেকে উন্নততর সাংস্কৃতিক মান, অর্থাৎ সর্বহারা সংস্কৃতিগত মান অর্জন করা ব্যতিরেকে এই তত্ত্ব সম্পর্কে বিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার প্রয়োগও সঠিক হতে পারে না। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও-এর মূল বিচারধারা সম্পর্কে যাঁরা জানেন, তাঁরাই আমাদের একথা বুঝতে সক্ষম হবেন। **এখানে আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে। প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগ ছাড়া মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে শুধুমাত্র বই পড়া জ্ঞান, অথবা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের সংযোজন ছাড়া শুধুমাত্র শোষিত মানুষের আন্দোলনগুলি পরিচালনার মধ্য দিয়ে অর্জিত যে জ্ঞান — এই দুটোই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে আংশিক জ্ঞান মাত্র।** সমস্ত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই জানেন, এই দুটোকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সংযোজিত করতে পারলেই কেবলমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক তত্ত্বের ধারণা অর্জন করা সম্ভব। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নততর সাংস্কৃতিক মান অর্জন করতে না পারলে এ দুটো আংশিক জ্ঞানকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সঠিকভাবে সংযোজন করে চৌকস জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, অর্থাৎ তত্ত্ব বিচারের ক্ষমতা অর্জন করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। এই দিকগুলি সম্পর্কে খেয়াল রেখেই দল বিচারের দুরূহ কাজটি আমাদের সম্পন্ন করতে হবে।

এছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও দল বিচারের সময় খেয়াল রাখতে হবে। দেখতে হবে, পার্টিটি কী পদ্ধতিতে, কোন্ ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এবং তার নেতৃত্ব সম্বন্ধে ধারণাটি কী? সেটি কি পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলির মতই আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক (formal democratic) নেতৃত্বের ধারণা, নাকি গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ প্রোলেটারিয়ান গণতন্ত্র ও একেন্দ্রীকরণের নীতির সংমিশ্রণের মারফত গড়ে ওঠা সেটি একটি যৌথ নেতৃত্বের ধারণা। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, বুর্জোয়া

(কমরেড শিবদাস ঘোষের 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল' বইটির বিভিন্ন অংশ থেকে উদ্ধৃত)

ভ্যাটের ফলে জিনিসের দাম বাড়তে শুরু করেছে

একের পাতার পর

উৎপাদন এবং বিক্রি করতে চান। তিনি প্রথম কাঁচামাল কেনার সময় বিক্রয়কর দিতেন। এই বোঝা নিয়ে পণ্যটি উৎপাদন হওয়ার পর বিক্রির সময় আরেকবার পণ্যটির ওপর বিক্রয়কর চাপত। যুক্তমূল্য করের বড় সুবিধা হল, উৎপাদিত পণ্যের বিক্রির ওপর কর থেকে কাঁচামাল কেনা বাবদ কর বিয়োগ করা হয়।'' অর্থাৎ কর কমে যায় এবং অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের ভাষায় যুক্তমূল্য করের এটাই হল 'বড় সুবিধা।' এই 'সুবিধা' বুঝতে কারও বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই 'সুবিধা' কাদের — কারা এর ফল ভোগ করবে? অসীমবাবু মোলায়েম করে বলার চেষ্টা করলেও কিন্তু গোপন করতে পারেননি — এই সুবিধা আসলে ভোগ করবে বড় শিল্পপতি-পুঁজিপতিরা।

করের উপর কর চাপার ঘটনা (কাসকেডিং এফেক্ট) বিক্রয়করে ঘটতো, কিন্তু ভ্যাটে তা ঘটবে না — এই 'তত্ত্বকথা' জেনে সাধারণ মানুষের লাভ কী! তাঁরা জানতে চান, ভ্যাটের ফলে বাজারদর কমবে না বাড়বে? এক্ষেত্রে অসীমবাবু কিন্তু বলছেন না, বাজার দর কমবে। তিনি বলছেন — দর কমা উচিত। অথচ বাস্তব কী বলছে? ইতিমধ্যেই সাবান, তেল, মাজন ইত্যাদির বহুজাতিক উৎপাদক হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড বলেই দিয়েছে, তাদের কোন পণ্যের দাম কমছে না (দ্রঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া, ৬-৪-০৫)। অথচ তাদের উপর কর ২৩.৫ শতাংশ থেকে কমে ১২.৫ শতাংশ হচ্ছে। এক্ষেত্রে কী বলবেন অসীমবাবুরা? বাজারে ইতিমধ্যেই ওষুধ অমিল, কোথাও কোথাও পণ্যের প্রচলিত দামের সঙ্গে ৪ শতাংশ ভ্যাট জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের জুতো উৎপাদকরা দেখিয়েছেন, ভ্যাটের ফলে জুতোর দাম বাড়বে (প্রতিদিন ৪-৪-০৫)। সাবান উৎপাদকরা দেখিয়েছেন, ভ্যাটের ফলে বৃহৎ পুঁজির সুবিধা হবে, ক্ষুদ্র সাবান প্রস্তুতকারকদের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে (প্রতিদিন ৫-৪-০৫)। ভ্যাটের ফলে কর যদি কমেও, তাহলেও দাম যে কমবে না বরং বাড়বে — ইতিমধ্যেই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া ভ্যাট সম্পর্কে রাজ্য বাজেটে বলা হয়েছে, রপ্তানিযোগ্য পণ্যে কোন কর দিতে হবে না। বলাবাহুল্য রপ্তানি পণ্য উৎপাদক বৃহৎ পুঁজি এতে লাভবান হবে। সিপিএম-এরই অর্থনীতিবিদ তাত্ত্বিক নেতা প্রভাত পট্টনায়ককেও স্বীকার করতে হয়েছে, ভ্যাট হল ''করব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ'' যা ''বৃহৎ পুঁজি চায়''। তিনি আরও বলেছেন — ''ভ্যাট হল উদারীকরণের অঙ্গ।'' (দ্রঃ ফ্রন্টলাইন, ২২.৪.০৫) অসীমবাবু কি বলবেন যে, প্রভাত পট্টনায়কও মিথ্যা প্রচার করছেন?

এক প্রশ্নের উত্তরে অসীমবাবু জানিয়েছেন — ''একটি রাজ্য এক বছর ধরে ভ্যাট লাগু করে রেখেছে। তাদের রাজস্ব ৩০ শতাংশ বেড়েছে।'' এই উদাহরণের দ্বারা তিনি দেখাতে চেয়েছেন, ভ্যাট চালু হওয়ার ফলে এই রাজ্যেও রাজ্য সরকারের আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু কীভাবে? আমরা আগেই দেখিয়েছি, ভ্যাট চালু

পাঁচের পাতায় দেখুন

গড়ে তোলার প্রয়োজন হল

শিবদাস ঘোষ

বিপ্লব যেহেতু উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদিকা শক্তি, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এবং এক অর্থে ব্যক্তির বিকাশ ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সেইহেতু বুর্জোয়া গণতন্ত্র, তা যত আদর্শস্থানীয় (model) গণতান্ত্রিক ফর্মেরই হোক্ না কেন, সেখানে গণতান্ত্রিক ফর্ম-এর মধ্য দিয়ে আসলে ব্যক্তিনেতৃত্বই কাজ করে থাকে। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিই হল কেন্দ্রবিন্দু এবং এ সম্বন্ধে সচেতন উপলব্ধি না থাকলেও বাস্তবে এক ব্যক্তি বা বিভিন্ন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রক্রিয়াটি গড়ে ওঠে। ফলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে আসলে গণতন্ত্রের নামে ব্যক্তিনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে এই গণতন্ত্রের চরিত্র হয়ে পড়ে ফর্মাল। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে উৎপাদনের ওপর যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লব, সেইহেতু শ্রমিকশ্রেণীর গণতন্ত্রে নেতৃত্বের ধারণা হচ্ছে যৌথ নেতৃত্বের ধারণা। ...

...এই যৌথ নেতৃত্বের ধারণা বলতে কী বোঝায়? লেনিন বলেছেন, দলের সকল সদস্যের যৌথ জ্ঞানই হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব। অর্থাৎ, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়েই নয়, জীবনের প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কে পার্টির সমস্ত সভ্যের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে সেই যৌথজ্ঞানের বিশেষীকৃত রূপে (concrete form) প্রকাশ হচ্ছে যৌথ নেতৃত্ব। ... যৌথ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে মানে হচ্ছে, দলের সমস্ত নেতা ও কর্মী, র‍্যাংক এ্যাণ্ড ফাইল, শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের সম্মিলিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে যৌথজ্ঞান গড়ে ওঠে, দলের সর্বোচ্চ কমিটির কোন একজন নেতার মধ্য দিয়ে তার সর্বশ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্তিকরণ ঘটেছে। দলের সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কোন একজন নেতার মধ্য দিয়ে যখন এইভাবে সর্বোত্তমরূপে ব্যক্তিকরণ হয়, নেতৃত্বের বিকাশের একমাত্র সেই স্তরেই দলের অভ্যন্তরে গ্রুপইজম এবং নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে ব্যক্তিনেতৃত্ব ও বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে খতম করা সম্ভব এবং দলের অভ্যন্তরে এই অবস্থার উদ্ভব হলেই একমাত্র বলা চলে যে, দলটি প্রোলেটারিয়ান গণতন্ত্রের নীতিকে চালু করতে এবং যৌথ নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে। ...

...এই যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার সংগ্রামটিই হল শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সংগঠনের আভ্যন্তরীণ কাঠামোটি গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে গড়ে তোলার মূল সংগ্রাম। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি পার্টির মধ্যে যৌথ নেতৃত্বের এরূপ ধারণা না গড়ে উঠছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে হবে, পার্টিটির আভ্যন্তরীণ কাঠামোটিও গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। ...

... একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক কাজগুলি কী?

প্রথমত, যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের নিজেদের মধ্যে প্রথমে চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে, এমনকী ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি প্রতিটি দিককে জড়িত করে, একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে গড়ে তুলে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণের বুনিয়াদ স্থাপনা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ... যৌথ নেতৃত্বের বাস্তব ও বিশেষীকৃত ধারণা গড়ে তোলার সংগ্রাম এক অর্থে পার্টি গড়ে তোলার প্রাথমিক সংগ্রাম। তাই চিন্তাজগতের সর্বক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ, সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা ও সম-উদ্দেশ্যমুখিনতা গড়ে তুলতে না পারলে যৌথ নেতৃত্বের এই বাস্তবীকৃত ও বিশেষীকৃত ধারণাটি দলের মধ্যে গড়ে তোলাই সম্ভব নয়, এবং যতদিন পর্যন্ত যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন সেই সমস্ত নেতা ও কর্মীদের মধ্যে যৌথ নেতৃত্বের এই বিশেষীকৃত ধারণার জন্ম না হয়, মনে রাখতে হবে, ততদিন পর্যন্ত দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দেবার সময় আসেনি। কারণ, এরূপ অবস্থায় দলের চূড়ান্ত সাংগঠনিক রূপ দিতে গেলে দলটি গণতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টির বদলে যান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত পার্টিতে পর্যবসিত হয় এবং যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার বদলে দলটি আনুষ্ঠানিকএবং ব্যুরোক্রেটিক নেতৃত্বের জন্ম দিয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, দলের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নেতা ও কর্মীদের এই নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই যাঁরা দল গঠন করতে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একদল প্রফেশনাল রিভলিউশনারির (জাত বিপ্লবীর) জন্ম দিতে হবে। মার্কসবাদের পরিভাষায় এই প্রফেশনাল রিভলিউশনারি বলতে পয়সার বিনিময়ে হোলটাইম ওয়ার্কার বোঝায় না। ... প্রফেশনাল রিভলিউশনারি হল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী সচেতন অংশের সেই অংশ, যাঁরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শকে এমনভাবে জীবনে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজন, নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে নিঃসংশয়ে, নির্দ্বিধায় ও আনন্দের সাথে বিপ্লবী জীবনের সংগ্রামের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় তাঁরা সবসময়ই লিপ্ত থাকতে সক্ষম এবং সমস্ত ব্যাপারে, এমনকী ব্যক্তিগত ব্যাপারেও, আনন্দের সাথে বিপ্লবের স্বার্থে পার্টির কাছে নির্দ্বিধায় সাবমিট করতে সক্ষম। একমাত্র এই প্রফেশনাল রিভলিউশনারিদের মধ্য থেকেই যদি পার্টির নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীরা আসে, তাহলেই একটি পার্টি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

মূলত এই তিনটি প্রাথমিক শর্ত পূরণ হওয়ার পরেই কেবলমাত্র সম্মেলনের মধ্য দিয়ে একটি কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধানসম্মত সাংগঠনিক কাঠামোর জন্ম দেওয়া যেতে পারে। এ না করে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দলের পুরো সাংগঠনিককাঠামোর একটি চূড়ান্ত রূপ কখনই দেওয়া সম্ভব নয়।...

...আমাদের দেশের পূর্বের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং বর্তমানে তিনভাগে বিভক্ত এই পার্টিটির ... প্রত্যেকেই পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার এই আসল সংগ্রামটি বাদ দিয়েই দল গঠনের চেষ্টা করেছেন। কর্মীদের সততা, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, লড়াই সবকিছু সত্ত্বেও ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করার জন্য পার্টি ও বিপ্লবের সাথে জীবনকে একাত্ম করে গড়ে তোলার সংগ্রামটি পার্টির অভ্যন্তরে সচেতন ও যৌথভাবে পরিচালনা না করতে পারার ফলে এদের কোনটিই একটি সঠিক বিপ্লবী দল হিসাবে কোনদিন গড়ে ওঠেনি। ফলে মার্কসবাদকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও পার্টির অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট চরিত্র গঠন এবং যারা পার্টি গঠন করার জন্য আত্মনিয়োগ করল তাদের মধ্যে (১) জীবনের সকল দিক ও প্রতিটি কার্যক্রমকে ব্যাপ্ত করে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা, অর্থাৎ সম-চিন্তাপদ্ধতি, সম-চিন্তা, সম-বিচারধারা, সম-উদ্দেশ্যমুখিনতা (২) যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত ধারণা এবং (৩) একদল প্রফেশনাল বিপ্লবী (জাত বিপ্লবী) গড়ে তোলার দীর্ঘ ও জটিল সংগ্রামটি এড়িয়ে যাবার ফলে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) উভয় দলই কতগুলো পেটিবুর্জোয়া রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সাধারণভাবে গৃহীত শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে একত্রে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে এবং নকশালপন্থীরা পার্টি গঠন করলে সেই পার্টিরও এই একই পরিণতি হবে।

তাহলে ... পূর্বের অবিভক্ত এবং বর্তমানে তিনভাগে বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কোন অংশের দ্বারাই, আর যে কাজই হোক্ না কেন, শোষিত মানুষের পুঁজিবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামের মত একটি জটিল সংগ্রামের নেতৃত্ব দেওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। আর তত্ত্বগত ক্ষেত্রে এদের নানা ভুলভ্রান্তির কথা বাদ দিলেও যে জিনিসটা আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনে সবচাইতে মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে, যা দেশের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধন করে চলেছে, তা হচ্ছে, এই পার্টিগুলির নেতা ও কর্মীদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সুবিধাবাদ এবং আচারআচরণ-উক্তিতে এদের যে নিম্ন সংস্কৃতিগত মান প্রতিফলিত হচ্ছে ... সেইগুলি কমিউনিস্ট আদর্শের মত এতবড় একটা বৈজ্ঞানিক ও মহান আদর্শের মর্যাদা জনসাধারণের চোখে ক্রমেই নামিয়ে দিচ্ছে। ফলে কমিউনিজমের আদর্শ এবং বিপ্লবী সংগ্রামের মহান প্রতীক লাল ঝান্ডার মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য এবং পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই এদেশে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা এবং তাকে শক্তিশালী করা দরকার । আর এইজন্যই দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই একটি সাম্যবাদী দলের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়েই এদেশে গড়ে উঠেছে।

ভ্যাটের ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির উৎস কী ?

চারের পাতার পর

হওয়ার ফলে শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ কমে যাবে এবং সেই অর্থে সরকারের আয়ও কমে যাবে। তাহলে আদায়ীকৃত মোট রাজস্বের পরিমাণ বাড়বে কীভাবে? বিষয়টি এবার আলোচনা করা যাক্।

প্রথমত, পূর্বের ব্যবস্থায় যারা বিক্রয়করের আওতাতেই ছিলেন না, এরকম অসংখ্য মানুষকেই এবার কর দিতে হবে। 'গণদাবী'তে ভ্যাটের উপর আলোচনায় (৫৭ বর্ষ ৩০ সংখ্যা) আমরা পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছি, আনুমানিক মাত্র ১৫৯৭ টাকা দৈনিক যার বিক্রি তেমন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে পর্যন্ত নতুন হারে যুক্তমূল্য কর গুণতে হবে। অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ সাধারণ ব্যবসায়ীকে পর্যন্ত এই কর গুণতে বাধ্য করার দ্বারা রাজ্য সরকার তাদের রাজস্বখাতে আয় বাড়াতে চাইছে। বিষয়টি থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য অসীমবাবু বারবার বলছেন — পাঁচ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা যাঁদের বার্ষিক বিক্রি, তাঁদের তাঁরা ছাড় দিয়েছেন। তাই "৬০ শতাংশ ব্যবসায়ী ভ্যাটের আওতায় আসবেন না।"

দ্বিতীয়ত অসীমবাবু জানিয়েছেন — "দেশে গড়ে মোট ৫৫০টি পণ্যের লেনদেন হয়। এর মধ্যে ৫০টি পণ্যকে পুরোপুরি করমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।" অসীমবাবুর এই বক্তব্য অর্ধসত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কেন একথা বলা হচ্ছে? আগে ১০০টি পণ্য বিক্রয়করের আওতার বাইরে ছিল (দ্রঃ ট্রেড সার্কুলার অক্টোবর, ২০০৪, ডায়রেক্টরেট অব কমার্শিয়াল ট্যাক্সেস, পশ্চিমবঙ্গ)। এখন ভ্যাটে করমুক্ত থাকছে মন্ত্রীর কথায় ৫০টি পণ্য (সরকারি তালিকায় অবশ্য ৪৬টি)। অর্থাৎ করমুক্ত পণ্যের সংখ্যা ১০০ থেকে কমিয়ে ৪৬ করে দেওয়া হল। এইভাবে তিনি আরও বেশি করে জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে রাজস্ব আদায়ের ফন্দি এঁটেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই ভ্যাটের জনবিরোধী চরিত্র স্পষ্ট হবে। পাঁউরুটি, বিস্কুট, পান, ডাল, ভুষি, মুড়ি, চিঁড়ে, খৈ, মুড়কি, চিনি, গুড়, ছাতু, রান্নার তেল, ডিম, গামছা, দুধ, নুন, পাঁপড়, জীবনদায়ী ওষুধ, পেসমেকার, স্টেন্ট, কার্ডিয়াক বেলুন ইত্যাদি বিক্রয়-করের আওতার বাইরে ছিল, এখন এগুলির উপর ভ্যাট বসানো হয়েছে।

তৃতীয়ত, করের হারও বাড়ানো হয়েছে। এ রাজ্যে পূর্বে বিক্রয়করের গড় হার ছিল ৮ শতাংশ। এখন ২৩০টি পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার ১২.৫ শতাংশ। এমনকী জীবনদায়ী নানা ওষুধ ও হার্ট সার্জারির নানা সরঞ্জামের উপর যেখানে আগে কোন বিক্রয়কর ছিল না, সেখানে ভ্যাটের কল্যাণে এখন ৪ শতাংশ কর বসেছে। এবং এই কারণেই ওষুধের উপর রাজ্য সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫ শতাংশ (ওষুধের ওপর ভ্যাট চালু হয়েছে ১লা ডিসেম্বর, ২০০৪ সাল থেকে)।

তাহলে ভ্যাট চালু হওয়ার ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীরা দেখছেন, তার উৎস কী? (১) অনেক বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীকে এই করের আওতায় নিয়ে আসা, (২) অনেক বেশি পণ্যকে, এমনকী খাদ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহকে এই করের আওতায় আনা, (৩) করের হার বৃদ্ধি করা। এই হল ভ্যাট চালুর মাধ্যমে রাজ্য সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির আসল রহস্য।

অসীমবাবু আরও বলেছেন — "আসলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

গরিব মানুষের উচ্ছেদই কি উন্নয়ন ?

তিনের পাতার পর

তৈরি হয়েছে জনবহুল এলাকার মধ্য দিয়ে। ফলে উচ্ছেদ হয়েছে কয়েক হাজার পরিবার। এর মধ্যে দরিদ্রতম অংশের মানুষেরা আশ্রয় নিয়েছে বিভিন্ন স্টেশনের আশেপাশে, ফুটপাতে, পার্কে; বাকিদের খবর জানা যায়নি।

অপারেশন সানশাইন

১৯৯৬ সালে বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি এবং তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে কলকাতাকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে কলকাতার ফুটপাত থেকে ৬০ হাজার হকারকে একসাথে তুলে দেবার চেষ্টা করে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার। এই সরকারি উদ্যোগের পোশাকি নাম ছিল 'অপারেশন সানশাইন'। রাতের অন্ধকারে রাজ্যের প্রথম সারির সিপিএম নেতাদের উপস্থিতিতে কয়েক হাজার পুলিশ, লেঠেলবাহিনী, রাজ্য সরকার ও পৌরসভার কর্তাব্যক্তিরা ঝাঁপিয়ে পড়ে হকারদের বিরুদ্ধে। লাঠিচার্জ করে, গ্রেপ্তার করে, বুলডোজার ও পে-লোডার চালিয়ে ফুটপাত হকারমুক্ত করা হয়। অভিযোগ ওঠে, লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র পুলিশ নষ্ট করেছে ও লুঠ করেছে। সরকারি উদ্যোগে হকার উচ্ছেদের কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়ে সারা রাজ্যে। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে দলমতনির্বিশেষে হকাররা সংগঠিত হয় এবং পুনর্বাসনের দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে সামিল হয়। এই সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের ফলেই হকাররা তাদের জীবিকা অর্জনের অধিকার আপাতত ফিরে পেতে সমর্থ হয়। গণআন্দোলনের ইতিহাসে এই সাফল্য নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।

টালিনালায় উচ্ছেদ

টালিনালার দু'পাশে মানুষ তিন-চার দশক ধরে বাস করছিলেন। এইরকম পরিবারের সংখ্যা ১৪০০। গত ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশ দিয়ে বলপূর্বক এদের উচ্ছেদ করা হয়। সরকারি মতে মেট্রো রেলের সম্প্রসারণের জন্য এটা করা হয়েছে। যদিও পরিবেশবিদ ও বাস্তুকারেরা এভাবে মেট্রো রেলের সম্প্রসারণের বিরোধিতা করেছিলেন। এতে টালিনালা বুজে যাবার আশঙ্কা আজ সত্যে পরিণত হতে চলেছে।

বিশ্বমানবাধিকার দিবসের লজ্জা

২০০২-এর ১০ ডিসেম্বর বেলেঘাটা খাল পরিষ্কার করার অজুহাতে খালের দু'পাশে ৪০০০ ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয় বুলডোজার চালিয়ে, ২০০ বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয় আগুন লাগিয়ে, স্কুলবাড়িগুলো মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এটা ছিল শহরের অন্যতম ঘন দরিদ্র বসতি। বিশ্বমানবাধিকার দিবসে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এতবড় ঘটনা ঘটেছে সিপিএম ফ্রন্টের আমলে, যারা মুখে প্রতিনিয়ত গরিবের স্বার্থের কথা বলে থাকে।

রাজারহাট নিউটাউন

কলকাতা শহরের উত্তর-পূর্বে রাজারহাটে নিউটাউন গড়ে তোলার জন্য হাজার হাজার একর কৃষিজমি ও জলাভূমি সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার চাষী ও জেলেদের নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে দখল করে। এর ফলে উচ্ছেদ হয় ৬১৭০ জন প্রান্তিক চাষী, ২১০৫ জন ছোট চাষী, ৪৬০৫ জন ভূমিহীন চাষী, ৪০০০ জন জেলে ও ২০০০ পরিবার। এদের পুনর্বাসনে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়নি। অথচ সরকার এই জমিগুলি সামান্য উন্নতিসাধন করে ৫ বছরের মধ্যে প্রায় ২৫-৩০ গুণ বেশি দামে বিক্রি করেছে। গরিব মানুষগুলোকে ঠকিয়ে উচ্ছেদ করে মুনাফা করার এক জঘন্যতম নজির হয়ে থাকবে এই ঘটনা (সূত্র ঃ কলকাতার উন্নয়ন ভাবনা — নাগরিক মঞ্চ প্রকাশনা)।

সুন্দরবন সাহারা প্রকল্প

বৃহৎ পুঁজির মালিক সাহারা গোষ্ঠীকে দিয়ে সুন্দরবনে বিলাসবহুল পর্যটনকেন্দ্র ও প্রমোদকানন তৈরি করানোর চেষ্টা করছে সিপিএম-এর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার। এর ফলে নদী তীরবর্তী বহু গ্রাম উচ্ছেদ হবে। স্বাভাবিক জীবিকা হারাবেন লক্ষাধিক মানুষ। শুধু তাই নয়, এর জন্য জীববৈচিত্র্য ধ্বংস ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাজ্যের বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীমহল। আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্রের নাম করে গড়ে উঠবে 'সেক্স ট্যুরিজম' ও আনুষঙ্গিক নোংরা ও অনৈতিক কার্যকলাপ। তার ফলে গ্রামীণ সংস্কৃতির অবক্ষয় হবে এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকট দেখা দেবে, যেমনটি ঘটেছে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও ক্যারিবিয়ানের সমুদ্রোপকূলবর্তী দেশগুলিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জনগণের একমাত্র ভরসা বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলায় এখন পর্যন্ত এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারেনি। একইভাবে সাম্প্রতিক অতীতে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় পারমাণবিক বৈদ্যুতিক কেন্দ্র স্থাপন করার অপচেষ্টা রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন, যার ফলে রাজ্য সরকার এই প্রকল্পকে রূপায়ণ করতে পারেনি।

গোবিন্দপুর রেলকলোনির শিক্ষা

সর্বশেষে দক্ষিণ কলকাতার গোবিন্দপুর রেলকলোনির বাসিন্দারা সম্মিলিত প্রতিরোধে সরকারের উচ্ছেদ অভিযান রুখে দিয়েছে। এখানে প্রায় ৩০ হাজার গরিব মানুষের বাস। ৫০-এর দশক থেকে ধীরে ধীরে এই কলোনি গড়ে উঠেছে প্রধানত পূর্ববঙ্গ থেকে আসা গরিব উদ্বাস্তু ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভিটেমাটি হারা ছিন্নমূল মানুষদের নিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণ ২৪ পরগণার এই ছিন্নমূল মানুষদের একটা অংশ এস ইউ সি আই-এর সমর্থক ও দরদী। শহরের সৌন্দর্যায়ন ও রেলের গতি বাড়ানোর অজুহাতে গত কয়েক বছর ধরেই এদেরকে উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে। কিন্তু প্রতিবারই সরকারের এই অপচেষ্টাকে এরা ব্যর্থ করে দেয় সংগঠিত প্রতিরোধের মাধ্যমে। এর জন্য গোবিন্দপুরের গরিব মানুষদের গড়ে তুলতে হয়েছে আন্দোলনের হাতিয়ার উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিরোধের মানসিকতা। সংসদীয় রাজনীতির বাধ্যতা এবং আসন্ন পুরনির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সরকারবিরোধী বৃহৎ সংসদীয় রাজনৈতিক দল, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু এও ঠিক যে, সেই দলের নেতৃত্বে কলকাতা পুরসভা হকার উচ্ছেদের কর্মসূচি নিয়েছে। বেলেঘাটা খালপাড়ের বসতি উচ্ছেদের সময় এরা নীরব ছিল। রেলমন্ত্রীত্ব হাতে থাকার সময় কলোনির আইনগত স্বীকৃতিদানের চেষ্টাও এরা করেনি। ঘটনাস্থলে সংসদীয় বৃহৎ দলের উপস্থিতি গোবিন্দপুরে সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকারের পুলিশ প্রশাসনকে কিছুটা হলেও সংযত হতে বাধ্য করেছে, এটা সত্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় সত্য হল, এই ছিন্নমূল সংগ্রামী মানুষদের সুসংগঠিত প্রতিরোধ। সেটাই এই উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের আপাতজয়ের মূল কথা। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, তারাতলা হাইড রোড এলাকায় কলকাতা বন্দরের জমির ওপর গড়ে ওঠা গরিবের বসতি, বেলেঘাটা খালপাড়ের বসতি, এবং গোবিন্দপুর রেল কলোনির বসতি উচ্ছেদ প্রতিরোধে এস ইউ সি আই-এর সংগ্রামী ভূমিকার কথা সাধারণ মানুষ জানলেও, বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র তা প্রচারের আলোয় আনেনি।

দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে রাজ্যে গরিব জনবসতির ওপর আক্রমণ আসছে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী। শাসকরা বলছে — এ দুনিয়া সব মানুষের জন্য নয় ; এর জল, মাটি, বাতাস, এর সৌন্দর্য, এর বুকে বাঁচার অধিকার শুধু তাদেরই যারা ক্ষমতাবান, যারা পুঁজির মালিক বা তাদের দোসর। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর তথাকথিত বিশ্বায়ন সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যকে নগ্নভাবে প্রকাশ করে মার্ক্সবাদের সত্যতাকে পুনরায় প্রমাণ করেছে। অভিজ্ঞতার তিক্ত নিরিখে গরিব মানুষকে বুঝতে হচ্ছে তার বাঁচার একটাই রাস্তা — তা হল সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ও এই বৈষম্যমূলক সমাজকে পাল্টানো।

ভ্যাটের ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সমস্যা বাড়বেই

পাঁচের পাতার পর

ভ্যাট ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা কমবে। ...বিক্রয়কর ব্যবস্থায় কী পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছিলাম, সেসম্পর্কে এই ভ্যাটই আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।'' কিন্তু নিশ্চিত বলা যায়, ভ্যাট ব্যবস্থা শিল্পপতি-পুঁজিপতি বা বড় বড় ব্যবসায়ীদের কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে আদৌ পারবে না। কারণ কর ফাঁকির মূলে আছে কর প্রশাসনের দুর্নীতি, যা দূর করার কোন উদ্যোগ সরকারের নেই। দেশের বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী অবাধে কেন্দ্রের ও রাজ্যের প্রাপ্য কর ফাঁকি দিয়ে চলেছে এবং তারা জাতীয় অর্থনীতির সমান্তরাল একটা কালো টাকার আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। সংবাদে প্রকাশ, এই সমস্ত পুঁজিপতিগোষ্ঠীর অনাদায়ী আয়করের পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা — যা আদায় করার জন্য কেন্দ্রের ভূতপূর্ব বিজেপি-তৃণমূল বা বর্তমানের সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকারের কোন উদ্যোগই লক্ষ করা যায়নি। সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকারের ভূমিকাও একই রকম। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটার জেনারেলের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৯৯-২০০২ অর্থাৎ এই তিন বছরে বিক্রয়কর খাতে রাজ্য সরকারের অনাদায়ী করের পরিমাণ ৪৩৭১.৭৭ কোটি টাকা। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে — ''(কর সংক্রান্ত) অমীমাংসিত মামলার সংখ্যা ১-৪-৯৬ থেকে ৩১-৩-২০০১ এ শতকরা ৪৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮,৫১০ থেকে ২৬,৫৮২তে পরিণত হয়েছে।'' বুঝতে অসুবিধা হয় না. এই বিপুল পরিমাণ মামলা মীমাংসার উদ্যোগ নিলে আরও কত শত কোটি টাকা কর হিসাবে রাজ্য সরকারের কোষাগারে ঢুকতে পারত। কিন্তু সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কারণ এই উদ্যোগ গ্রহণ করলে সিপিএম সরকারের বন্ধু শিল্পপতিরা অখুশি হতে পারেন। ফলে যে সরকার দিনের পর দিন বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীদের কর ফাঁকি দিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা দান করেছে, ভ্যাট চালু হওয়ার পর সেই সরকারের চরিত্র রাতারাতি পাল্টে যাবে, এটা কি বিশ্বাস করা যায়?

দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অসীমবাবু আরও কিছু কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেছেন — ''যাঁদের বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ ৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে, তাদের জন্য একটি সরল বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মোট বার্ষিক বিক্রির ওপর এদের কর দিতে হবে মাত্র ০.২৫ শতাংশ হারে। প্রথমত, এতে করের হার অনেক কম। দ্বিতীয়ত, এতে ওই হিসেবও রাখার দরকার নেই।''

অসীমবাবু অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু এক্ষেত্রে আসল কথাটাই বলেননি। ভ্যাট আইনে বলা হচ্ছে — ''Input tax credit may not be allowed on purchases from a registered dealer who has opted to pay composite tax under the provision of the act.'' অর্থাৎ ভ্যাটে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যদি অসীমবাবুর কথামতো কেউ কম্পোজিট ট্যাক্সের আওতাভুক্ত হন, তবে তাঁর খরিদ্দারেরা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবে না। অর্থাৎ তাঁর কাছে কাঁচামাল কিনলে দেয় ট্যাক্সের টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে না। এইরকম হলে সেই ব্যবসায়ীর কাছে কে পণ্য কিনতে যাবে? কাজেই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ভ্যাটের আওতায় নাও আসতে পারেন, অসীমবাবুর এই কথাটা মিথ্যার চেয়েও ভয়ঙ্কর — অর্ধসত্য।

ভ্যাটের ফলে ব্যবসায়ীদের কর জমা দিতে কত সুবিধা হবে, এবার অসীমবাবু সেকথা সংবাদপত্রকে সবিস্তারে বলেছেন। তাঁর ভাষায় — ''ব্যবসায়ীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সুবিধা দেবে এই ভ্যাট। আগের ব্যবস্থায় একজন ব্যবসায়ী যখন তাঁর প্রদেয় করের রিটার্ন এবং কর থেকে সংগৃহীত অর্থ জমা দিতেন, তা নির্ধারণের জন্য তাঁকে কাগজপত্র নিয়ে বিক্রয়কর অফিসে যেতে হত। ...কিন্তু ভ্যাটে করের পরিমাণ একজন ব্যবসায়ী নিজেই নির্ধারণ করবেন। ...প্রথমে একজন বিক্রেতা আগের স্তর, অর্থাৎ পণ্য কেনা পর্যন্ত যে কর দিয়েছেন, তা লিখবেন। পরে তিনি লিখবেন, তিনি বিক্রি বাবদ নিজে যে কর সংগ্রহ করেছেন সেটা। আউটপুট ট্যাক্স থেকে ইনপুট ট্যাক্স বিয়োগ করবেন তিনি নিজেই। সেই ফলই হবে তার নিট দেয় কর বা নিট ট্যাক্স। তিনি এইভাবে হিসেব করে যা জমা দেবেন, সরকার সেটাই মেনে নেবে।''

অসীমবাবুর কথা শুনে মনে হয় বিষয়টা একেবারে সহজ — জলবৎ তরলং। ব্যবসায়ী নিজেই ইনপুট ট্যাক্স লিখবে, সারাদিন বিক্রিবাটার পর হিসাব কষে আউটপুট ট্যাক্স লিখবে এবং এইভাবে সারা বছর লেখালেখির পর বৎসরান্তে সরকারের ঘরে গুণে গুণে কর জমা দেবে। এর থেকে আর সহজ কাজ কী হতে পারে!

অসীমবাবু বিষয়টা সোজা করে দেখালেও বাস্তবে এটা খুবই কঠিন। ভ্যাটের আওতাভুক্ত একটা সংস্থার কথা ধরা যাক্। বেচাকেনার পণ্যের সংখ্যা অনেক। আবার প্রতিটি পণ্য সবসময় একদামে কেনা হয় না — বিক্রয়মূল্যও এক থাকে না। ফলে ভ্যাটে প্রদেয় ট্যাক্সের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য পণ্য ধরে ধরে দামের ওঠাপড়ার হিসাব সহ তাকে প্রতিদিন হিসাব রাখতে হবে। আবার মনে রাখতে হবে, অনেক ব্যবসায়ীর পণ্য আগে বিক্রয়করে ছাড়ের তালিকায় ছিল, যাঁদের এখন ভ্যাট দিতে হবে। ফলে ভ্যাটের আওতাভুক্ত ব্যবসায়ীদের অনেকেরই আগে বিক্রয়কর দেওয়ার কোন অভিজ্ঞতা নেই। এই অবস্থায় ভ্যাটের হিসাব রাখার জন্য তাঁকে হয় বাড়তি খরচ করতে হবে, না হয় ভ্যাট ইন্সপেকটরদের সাথে একটা অবৈধ বন্দোবস্ত করতে হবে। এ ছাড়া তাঁর সামনে আর কোন বিকল্প পথ খোলা থাকবে না। যে পথই সেই ব্যবসায়ী গ্রহণ করুন না কেন — তাতে তার খরচ বাড়বে এবং এর প্রভাব পণ্যের মূল্যের উপর

সাতের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ

একের পাতার পর

মাশুল নীতিতে ৩০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ৫০ শতাংশ ছাড়ের কথা বলা হলেও কমিশন তাতে কর্ণপাত করেনি। অ্যাবেকার নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলনের চাপে মাশুল নির্ধারণে আয়করের স্ল্যাব প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করতে কমিশন বাধ্য হয়েছে। এটা আন্দোলনের জয়। কিন্তু গড় মাশুল কমে যাওয়ার সুফল অত্যন্ত সুকৌশলে শিল্প গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে সাধারণ গ্রাহকদের ইউনিট প্রতি দাম বাড়ানো হয়েছে। তাই পরিপূর্ণ বিজয়ের জন্য তিনি আরও তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এরপর কমিশনের কালা সার্কুলার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। ঐ সমাবেশ থেকে ঘোষিত পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে ১২ এপ্রিল জেলায় জেলায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রতিটি ক্যাশ কাউন্টারে কালা সার্কুলার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

৪ এপ্রিল কলকাতায় পর্ষদ দপ্তরে বিদ্যুৎগ্রাহকের বিক্ষোভ

সেনাদলে যোগ দিতে নারাজ মার্কিন যুবকরা

একের পাতার পর

যুদ্ধবিরোধী গণফ্রন্টগুলি আন্দোলনে সামিল হয় তবে সেটা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে বিরাট বিপদ। সেই বিপদ আরও বহুগুণে বেড়ে যায় যদি সাম্রাজ্যবাদী দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষ দাঁড়িয়ে যায়। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, যুদ্ধ পরিকল্পনা, দেশে দেশে হানাদারি, অন্য দেশকে পদানত করা বা আধিপত্যাধীনে আনার জন্য চাপ সৃষ্টি করা — সবই এক সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানসিকতার জন্ম দেয় এবং বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের জমি তৈরি করে।

নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের পতনের পর যাঁরা ভেবেছিলেন সাম্রাজ্যবাদই ইতিহাসের শেষ কথা — আজ তাঁরা ভ্রান্ত প্রমাণিত। সোভিয়েটে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর সেখানে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং চীন পুঁজিবাদের পথে পা বাড়ানো সত্ত্বেও বিশ্বপুঁজিবাদের বাজার সংকট কমেনি, বরং বেড়েছে। একমেরুবিশিষ্ট পুঁজিবাদী বিশ্বে বাজার দখল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মারাত্মক রূপ নিয়েছে। বিশ্ববাজারকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবার জন্য একের বিরুদ্ধে অপরের জোট গড়ে উঠেছে। আমেরিকার পুঁজির দাপটের সাথে টেক্কা দিতে ইউরোপের ২৫টি দেশ জোটবদ্ধ হয়ে ই-ইউ গড়ে তুলেছে। আবার বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে দরকষাকষির শক্তি বাড়াবার জন্য ২০টি দেশ মিলে জি-২০ গড়ে তুলেছে। আবার এই গ্রুপগুলির মধ্যে অবিরত ভাঙাগড়াও চলছে। এদিকে আবার ভারত প্রতিবেশী কিছু দেশে নিজস্ব আধিপত্য এবং ব্যবসার সুযোগ কায়েম রাখতে আঞ্চলিক জোট গড়ে তুলছে। বিশ্ববাজার দখল নিয়ে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র — সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশ বা জোটসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সোভিয়েট সমাজতন্ত্র পতনের পর মারাত্মকভাবে বেড়েছে। অন্যদিকে বেকারি, ছাঁটাই, শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার হরণ, কাজের বোঝা বৃদ্ধি ও বেতন হ্রাস — ইত্যাদির মোকাবিলায় শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি সাম্প্রতিককালে বিশ্ববৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। ফলে সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণ-আগ্রাসন যেমন আজ বাস্তব, তেমনি তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামটাও সমান বাস্তব হিসাবে এসেছে এবং তা গড়েও উঠছে।

সাম্রাজ্যবাদ মানুষের কাছে ঘৃণার বিষয় হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদীরা নতুন পোশাকে বিশ্বায়নের বেশ ধারণ করে আবির্ভূত হয়। বিশ্বায়ন কিছুদিনের জন্য মানুষের মধ্যে একটা মোহ তৈরি করতে সমর্থ হলেও এবং এদেশের কিছু বামপন্থী দল বিশ্বায়নের সুফল নিতে হবে বলে বক্তৃতা করলেও আজ বিশ্বায়ন ছাঁটাই-বেকারি-বেসরকারীকরণ - অধিকার হরণ-এর সমার্থকে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়ন যে বিশ্বজোড়া পুঁজির বর্বর শোষণ একথা সাধারণ মানুষ জীবনের নির্মম আঘাতে উপলব্ধি করছে। বিশ্বজুড়েই এখন বিশ্বায়নবিরোধী বিক্ষোভ চলছে। বিশ্বায়নের মোহজাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এটা কীসের ইঙ্গিতবাহী? কোন একটা সত্তা যখন আপন মহিমায় টিকে থাকতে পারে না, যখন তাকে টিকে থাকার জন্য নানারকম কৌশল নিতে হয় এবং সেই কৌশলও সহজেই মানুষের কাছে ধরা পড়ে যায় তখন সেই সত্তা নিঃসন্দেহে অস্তিত্বের সংকটে জর্জরিত। সাম্রাজ্যবাদ আজ এই স্তরে উপনীত হয়েছে। এর থেকে তার আর বাঁচার রাস্তা নেই। যুদ্ধনির্ভর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া বিক্ষোভের প্রকৃতি এই প্রত্যয়ই এনে দেয়।

মুর্শিদাবাদ

রানিনগর শিক্ষার অধিকার রক্ষা কমিটির ডেপুটেশন

মুর্শিদাবাদের রানিনগর হাইস্কুলে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে নানা দুর্নীতি, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও একটি চক্রের স্কুল সার্ভিস কমিশনকে এড়িয়ে ১০ জন শিক্ষক নিয়োগ এবং পরে আরও ৩ জন শিক্ষক ও একজন অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ নিয়ে স্কুলে নানা গণ্ডগোলে পঠন-পাঠন প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে। সুষ্ঠু পঠন-পাঠনের দাবিতে অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী ও এলাকার মানুষজন 'রানিনগর শিক্ষার অধিকার রক্ষা কমিটি' গড়ে তুলে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ৯ মার্চ এই কমিটির প্রতিনিধিরা রাজ্যের শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা তপন রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের কাছে ডেপুটেশন দেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগর সহ আরও কয়েকটি স্কুলে অনিয়ম, নানা দুর্নীতি সহ বহু অভিযোগ তিনি পেয়েছেন। তিনি ডি-আইকে রানিনগর স্কুলে তদন্তের নির্দেশ দেন।

ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন ইস্রাফিল হোসেন, রওসন আল হেলাল, আবুল সালাম ও মজিবর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

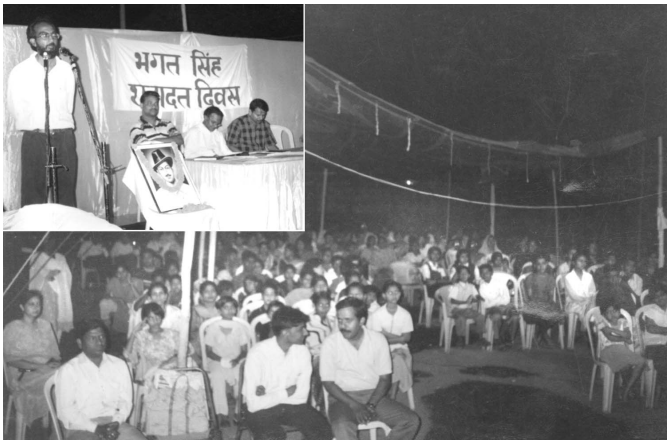

২৩ মার্চ জামশেদপুরের এগ্রিকো দুর্গাপূজা প্রাঙ্গণে ডি এস ও এবং এম এস এস-এর উদ্যোগে ভগৎ সিং শহীদ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সভা হয়। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক পল্লবকান্তি বিশ্বাস, অধ্যাপক মনোজ মহাপাত্র, ডঃ বিজয় কুমার পীযূষ এবং বিশিষ্ট কবি অসিত কুমার কুণ্ডু। সভার সঞ্চালক ছিলেন সুমিত রায়।

ভ্যাট প্রসঙ্গে

ছয়ের পাতার পর

পড়বেই। সহজ সরল এই কথা অসীমবাবুরা অস্বীকার করতে পারেন?

অসীমবাবু বলেছেন, ব্যবসায়ী ''হিসেব করে যা জমা দেবেন, সরকার সেটাই মেনে নেবে।'' সরকার সত্যিই কি তা মেনে নিতে পারে? না, নেওয়া উচিত? এর একটাই উত্তর, না। ভ্যাট আইনে পরিষ্কার বলা হয়েছে — ''Correctness of self-assessment may be checked through a system of audit, where a percentage of dealers may be taken for audit on a scientific basis.'' অর্থাৎ, আইন বলছে, হিসাব কষে যা বলা হবে সরকার সেটা মেনে নেবে না। তাহলে প্রশ্ন হল, সরকার সে হিসাব যাচাই করবে কী করে? অসীমবাবু বলেছেন, ''ব্যবসায়ীরা নিজেরাই হিসেব করে যে কর জমা দেবেন, তা ঠিক কিনা দেখার জন্য পাঁচ শতাংশেরও কম ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নমুনা সমীক্ষা করা হবে। অনেক আগে নোটিশ দিয়ে ব্যবসায়ীর খাতাপত্র পরীক্ষা করা হবে।'' বোঝা গেল, ৫ শতাংশের ক্ষেত্রে আগে থেকে নোটিশ দিয়ে খাতাপত্র পরীক্ষা করা হবে। কিন্তু বাদবাকী ৯৫ শতাংশের কী হবে? ভ্যাট আইনে পরিষ্কার বলা হয়েছে — ''In the VAT Act much weightage is given to audit work in place of routine assessment work. The authorised officers of the department will visit the business place of a dealer and conduct the audit''. অর্থাৎ বাস্তবে এজন্য ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র প্রস্তুত করে সবসময় তটস্থ থাকতে হবে — কখন কাগজপত্র পরীক্ষার নামে সরকারি অফিসারদের দৌরাত্ম্য শুরু হবে তার জন্য। বড় বড় ব্যবসায়ীরা ছলে-বলে-কৌশলে, দুর্নীতিগ্রস্ত কর প্রশাসনের সহায়তায় এই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন, কিন্তু সমস্যায় পড়বেন ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা।

'ভ্যাট চালু হওয়ার ফলে জিনিষপত্রের দাম কি বাড়তে পারে?' — এই প্রশ্নের উত্তরে অসীমবাবু জানিয়েছেন — ''আমাদের রাজ্যে এরকম সম্ভাবনা কম। বাইরের রাজ্যে এটা হতে পারে। তবে রেফ্রিজারেটরের মতো উচ্চবিত্তের কিছু জিনিসের দাম বাড়তে পারে।'' অসীমবাবুর এই জবাব কতটা যুক্তিযুক্ত? ভ্যাটের ফলে অন্যান্য রাজ্যে যদি জিনিসপত্রের দাম বাড়তে পারে, তবে পশ্চিমবঙ্গে বাড়বে না কেন? পশ্চিমবঙ্গের জন্য কি অসীমবাবুরা আলাদা মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধী ব্যবস্থা চালু করেছেন? আমরা আগেই দেখিয়েছি, ভ্যাট চালু হওয়ার ফলে অনেক বেশি মানুষকে করের আওতায় আনা হয়েছে, নতুন নতুন পণ্যের ওপর কর বসানো হয়েছে এবং দু'একটি ক্ষেত্রে (যেমন রান্নার গ্যাস) ছাড়া, গড়পড়তা করের হার বৃদ্ধি করা হয়েছে, ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পরিচালনার খরচ বাড়ানো হয়েছে — এই সমস্ত কিছুই জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবেই। রান্নার গ্যাসের দাম কয়েক টাকা কমিয়ে অন্যান্য বহু পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সরকার জনগণকে দিয়ে মানিয়ে নিতে চাইছে। যত দিন যাবে, ভ্যাট ব্যবস্থা ভেঙে না পড়ে যদি চেপে বসে, তবে মূল্যবৃদ্ধি যে ঘটবেই তার লক্ষণ এখনই দেখা যাচ্ছে, দিনে দিনে তা আরও অসহনীয় হবে। তাই ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি তুলতে হবে সকলকে।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

‘কমরেড রেণুপদ হালদার আমৃত্যু বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন’

জয়নগরের স্মরণসভায় কমরেড মানিক মুখার্জী

এস ইউ সি আই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য, কৃষকদের ঐতিহাসিক তেভাগা সংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলনের বলিষ্ঠ নেতা প্রয়াত কমরেড রেণুপদ হালদার স্মরণে ৩ এপ্রিল বিকাল ৫টায় জয়নগর রক্তাখাঁ পাড়া মাঠে এক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩১ মার্চ তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দলের কর্মী-সমর্থক-দরদী সহ সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই গোটা মাঠ ভরে যায়। এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে দলের নেতা-কর্মী, বিভিন্ন লোকাল কমিটি, গণসংগঠন, শ্রমিক ইউনিয়ন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রয়াত নেতার ছবিতে মাল্যদান করেন। প্রয়াত নেতার স্ত্রী কমরেড অনিতা হালদারও মাল্যদান করেন। সভার শুরুতেই সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর কমরেড রেণুপদ হালদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে দু-মিনিট নীরবতা পালন করেন।

সভা পরিচালনা করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান। তিনি প্রয়াত কমরেড রেণুপদ হালদারের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, ‘‘কমরেড শচীন ব্যানার্জীর সান্নিধ্যে এসে আমি যখন দলের সাথে যুক্ত হই, তার আগেই কমরেড রেণুপদ হালদার যুক্ত হয়েছেন। দিল্লিতে তিনি চাকরি করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু দলের ডাকে চাকরি ছেড়ে চলে আসেন। তখন জেলা বোর্ড নির্বাচনে এস ইউ সি আই সমর্থিত প্রার্থী শ্রীধর মণ্ডলের সমর্থনে জনমত সংগঠিত করবার জন্য শচীনদা আমাদের নির্দেশ দেন, জায়গাও নির্দিষ্ট করে দেন। আমি, কমরেড রেণুপদ হালদার সহ সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে পড়ি। কমরেড রেণুপদ হালদারের দায়িত্ব পড়ে ১৩নং গুড়গুড়িয়া ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায়। কোথায় থাকবো, কী খাবো — কিছুরই সেদিন ঠিক ছিল না। দুর্গম দ্বীপাঞ্চলে গিয়ে তিনি কাজ করেছেন, চাষী-মজুরদের সংগঠিত করেছেন। পরবর্তীকালে বাস-রিক্সা-ভ্যান-অটো-ট্রেকার এবং দোকানের শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।’’

কমরেড পৈলান বলেন, ‘‘অনেকেই কথা গুছিয়ে বলতে পারেন, কথা বলতেও শিখেছেন, কিন্তু সর্বস্তরের মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে চলা, সকলের গ্রহণযোগ্য হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারা অত্যন্ত কঠিন। এক্ষেত্রে কমরেড হালদার ছিলেন এক বিরল চরিত্রের উদাহরণ।’’ কমরেড পৈলান আরও বলেন, ‘‘৫০-এর দশকের শুরুতে আমাদের দুজনের পরিচয়, তারপর দীর্ঘ এতগুলো বছর একসঙ্গে চলেছি, কিন্তু আমার সঙ্গে তো নয়ই — অন্য কারও সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনো তিক্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে, দলের প্রয়োজনকে তিনি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। সাংসারিক সমস্যা, অভাব-অনটন কখনো তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করেছে বলেও আমার জানা নেই।’’

দলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণার সংগঠিত-অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠিত করে তাদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন কমরেড রেণুপদ হালদার। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি এবং সর্বভারতীয় কাউন্সিলের সদস্য।

দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং স্মরণসভার প্রধান বক্তা কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, ‘‘কমরেড রেণুপদ হালদার আমৃত্যু বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী। একজন বিপ্লবীকে তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তেও পরীক্ষা দিয়ে যেতে হয়। জীবনে চলার পথে তো বটেই, এমনকী রোগশয্যায়, মৃত্যুর মুহূর্তেও যাতে তাঁর স্খলন না ঘটে, সেজন্যও তাঁকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। সেই সংগ্রামে কমরেড রেণুপদ হালদার উত্তীর্ণ।’’ তিনি বলেন, ‘‘কমরেড রেণুপদ হালদার নিজে যেমন বিপ্লবী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তেমনি পরিবারকেও এই সংগ্রামে যুক্ত করেছিলেন। তিনি যখন বিধানসভার এম এল এ, তখন তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে সংবাদপত্রেই খবর বেরিয়েছিল — ‘শিশুকোলে এম এল এ পত্নী রাজপথের মিছিলে।’ তিনি ছিলেন অমায়িক, নির্বিরোধী ; কিন্তু যেখানে নীতি-আদর্শের প্রশ্ন দেখা দিত, সেখানে তিনি কখনও আপস করেননি। একসময় কমরেড রেণুপদ হালদার কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় কমিউনে ছিলেন। সেখানে কমরেড শিবদাস ঘোষ থাকতেন। সেসময় আমি দেখেছি, কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনা, কোনও কথা না বলে গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি শুনতেন, তর্ক-বিতর্কে অংশ নিতেন না, নীরবে সব শুনতেন। তাঁর চরিত্র থেকে বোঝা যায়, শুনে শুনে তিনি কমরেড ঘোষের মূল শিক্ষাকে উপলব্ধি ও আত্মস্থ করার চেষ্টা করতেন।’’

কমরেড মুখার্জী বলেন, ‘‘যে সময়ে কমরেড শচীনদার মাধ্যমে কমরেড রেণুপদ হালদার, কমরেড ইয়াকুব পৈলানরা দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এবং দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন — তখন যে কী প্রতিকূল পরিস্থিতি ছিল, তা আজকের কর্মীরা ভাবতেও পারবে না। আজ এস ইউ সি আই পশ্চিমবাংলার গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে, রাজ্যের জনমানসে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেদিন এস ইউ সি আইকে কেউ চিনত না, নেতা-কর্মীদের থাকা-খাওয়ার জায়গা ছিল না। দুর্গম সুন্দরবন এলাকা নদীনালায় বিচ্ছিন্ন, রাস্তাঘাট নেই, যানবাহন বলতে সম্বল ছিল একমাত্র নৌকা। সেই অবস্থায় কমরেড রেণুপদ হালদার, কমরেড ইয়াকুব পৈলানের মত হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে জীবনে গ্রহণ করে কঠিন ও কঠোর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, শোষিত-বঞ্চিত চাষী-খেতমজুর-সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। শচীনদার কথায় কমরেড হালদার সেদিন চাকরি ছাড়তেও দ্বিধা করেননি, এই সত্যটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

‘‘পরবর্তীকালে পুঁজিবাদী শোষণ-লুণ্ঠনের অনিবার্য পরিণামে যখন শ্রমিকের উপর শোষণ-নির্যাতন বেড়েছে তখন কমরেড রেণুপদ হালদারকে দেখা গেছে শ্রমিক আন্দোলনের সামনের সারিতে। বাসের শ্রমিক, ভ্যান-রিক্সা চালক শ্রমিক, অটো ও ট্রেকারের শ্রমিক, দোকান কর্মচারী সহ বিভিন্ন সংগঠিত-অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের তিনি সংঘবদ্ধ করেছেন, তাদের জীবন-জীবিকার সমস্যা নিয়ে লড়াই করেছেন। এই সংগ্রাম চালাতে চালাতেই তিনি বিধানসভায় চারবার এম এল এ নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর চরিত্র ও আচরণ বিরোধী দলের এম এল এ-দেরও মুগ্ধ করত। তাঁর বন্ধুত্বের এমনই আকর্ষণ ছিল যে, সেসময় অন্য একটি বামপন্থী দলের একজন এম এল এ নিজের দল ছেড়ে আমাদের দলে যোগ দেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন।

‘‘বয়স বাড়ার পর কমরেড রেণুপদ হালদার যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, দৌড়ঝাঁপ করে বাইরের কাজ করতে পারতেন না, তখনও শরীর একটু সুস্থ বোধ করলেই জেলা অফিসে চলে এসেছেন, সকলের সংবাদ নিয়েছেন, সাধ্যমত সহযোগিতা করেছেন, কলকাতার মিটিংগুলোতেও গিয়েছেন।’’

কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, ‘‘কমরেড রেণুপদ হালদারের মত চরিত্র একদিনে গড়ে ওঠে না, এটা একটা দীর্ঘ সংগ্রামের ফল। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষা অনুসরণ করে এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগ্রামে আত্মনিয়োগের মধ্য দিয়েই এই চরিত্র গড়ে উঠেছে। আজ আমরা তাঁর স্মরণসভায় এসেছি, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে। এটা নিছক গতানুগতিক একটা অনুষ্ঠান নয়। এই সভায় তাঁর জীবনসংগ্রামের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা স্মরণ করছি আমাদের জীবনে চর্চা করার জন্যই — তিনি যে প্রক্রিয়ায় জীবনসংগ্রাম পরিচালনার দ্বারা এই গুণাবলী অর্জন করেছিলেন সেই প্রক্রিয়ায় নিজেদের আরও গভীরভাবে নিয়োজিত করার জন্যই। তবেই আমরা কমরেড রেণুপদ হালদারের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানাতে পারব, তাঁর অপূরিত কাজকেও সফল করতে পারব।’’

এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও জয়নগরের বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। প্রধান বক্তার আলোচনা শেষে আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

সরকারকে ন্যায্য দামে পাটবীজ সরবরাহ করতে হবে

এস ইউ সি আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

‘‘রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাষীদের পাটের বীজ সরবরাহ করছে না। মজুতদার-কালোবাজারীরা অত্যধিক মূল্যে অর্থাৎ গত বছর যেখানে ২৫ টাকা কেজি দরে বীজ বিক্রি হয়েছিল, এবার সেখানে ১৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছে। ফলে পাটচাষীরা বীজ কিনতে পারছে না। সকল পাটচাষীদের বীজ সরবরাহ করার জন্য এবং খোলাবাজারে দাম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।’’

২৪ এপ্রিল
এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবসে
সমাবেশ
শহীদ মিনার ময়দান, বিকাল ৪-৩০টা
বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ
সভাপতি ঃ কমরেড ইয়াকুব পৈলান

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in